এই লেখাটি "দ্য ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট" এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশু-কিশোরদের অহেতুক ভয়

ডঃ রোকেয়া বেগম
প্রফেসর ও চেয়ারপার্সন
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দশ বছরের মেয়ে লিরা হঠাৎ করে একদিন তার মাকে জানালো সে আর স্কুলে যাবে না। মা বাবা ভেবে অস্থির কেন লিরা স্কুলে যাবে না? ক্লাসের পড়া তো সে প্রতিদিনই তৈরি করে। প্রতি বছর পরীক্ষায় মেধা তালিকায়ও তার নাম থাকে। গান ও আবৃত্তিতে সে অত্যন্ত পটু। স্কুলের শিক্ষিকারা এবং ক্লাসের বন্ধুরা তাকে খুব ভালবাসে। তবে কেন সে স্কুলে যাবে না। জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁরা লিরার কাছ থেকে জানলেন যে, স্কুলের দোতলায় ওঠার সিঁড়িটাকে সে অত্যন্ত ভয় পায়– মনে হয় ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই সিঁড়িটা ভেঙ্গে যাবে, পড়ে গিয়ে আঘাত পাবে এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অথচ আগে ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তার কোন ভয় ছিল না, কোনো দিন পা পিছলে পর্যন্ত যায় নি। মা বাবা দুজনেই স্কুলে গিয়ে দেখলেন সিঁড়িটা অত্যন্ত মজবুত, ভেঙ্গে যাওয়ার কোন কারণ নেই। ঐ সিঁড়ি দিয়ে দৈনিক বহুবার শত শত ছাত্র-ছাত্রীরা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা উঠানামা করছেন। ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দোতালায় লিরাকে তার ক্লাসে যেতে হবে, সুতরাং সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ভয় পেলে সে ক্লাসে যাবে কেমন করে? স্কুলের সিঁড়িকে ভয় পাওয়া হলো লিরার ভয় নয়-অহেতুক ভয়। লিরার এই অহেতুক ভয় প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করবো, তার আগে আমরা জেনে নেই ভয় আসলে কি আর অহেতুক ভয়ই বা কি? স্বাভাবিক ভয়ের সঙ্গে অহেতুক ভয়ের পার্থক্য কোথায়?

ভয় হলো হাসি, কান্না, রাগ, ভালবাসা ইত্যাদির মত একটি আবেগ। শিশু-কিশোররা নানা কারণে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা পরিস্থিতিকে ভয় পায়। শৈশবকালীন ভয়কে শিশু বিকাশের একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে গণ্য করা হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ভয় কমতে থাকে আবার কিছু কিছু নতুন ভয়ের সংযোজন হয়। বেশির ভাগ শিশু-কিশোরদের মধ্যে ভয় স্বল্পস্থায়ী হয় আবার কারও কারও মধ্যে কেবল ভয় নয় দেখা যায় অহেতুক ভয় (PHOBIA) যা তাদের আচরণের উপর দীর্ঘস্থায়ী বিরূপ প্রভাব ফেলে।

যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি অথবা পরিস্থিতিকে শিশু-কিশোররা অহেতুক অনবরত ভয় পায় যে গুলোকে ভয় পাওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই সে ধরণের ভয়কে অহেতুক ভয় বলে। স্বাভাবিক বা সাধারণ ভয় এবং অহেতুক ভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণ ভয় একটি স্বাভাবিক এবং সাময়িক প্রতিক্রিয়া যা নানা কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বয়সের শিশু-কিশোরদের মধ্যে দেখা যায়। অহেতুক ভয়ে ভয়ের প্রতিক্রিয়া থাকে তীব্র, অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন এবং দীর্ঘস্থায়ী। ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক হলেও অহেতুক ভয়ে আক্রান্ত শিশু-কিশোর ভয়ের বস্তু বা ঘটনার সম্মুখীন হতে চায় না বরং যে কোন উপায়ে তা পরিহার করার পথ খোঁজে। তাছাড়া সাধারণ বা স্বাভাবিক ভয়ের চেয়ে অহেতুক ভয় দৈনন্দিন কাজ কর্মে বেশি বিঘ্ন ঘটায়।

অহেতুক ভয় এক ধরনের মানসিক রোগ। এই রোগে আক্রান্ত শিশু-কিশোররা বুঝতে পারে যে তাদের ভয় অনেকটাই অমূলক কিন্তু ঐ ভয় কি ভাবে দমন করবে অথবা ভীতি উদ্রেককারী বস্তুটির সঙ্গে কিভাবে মোকাবেলা করবে তা তারা বুঝতে পারে না। অনেক সময় অহেতুক ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তারা অস্বস্থি বোধ করে, তাদের হৃদকম্পন বেড়ে যায়, শ্বাসরোধ হয়ে আসে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ভয় এবং অহেতুক ভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করা যেতে পারে। উঁচুস্থানের ভয় অথবা বদ্ধ জায়গার ভয় অনেক শিশু-কিশোরের মধ্যে স্বল্পমাত্রায় থাকতে পারে, কিন্তু ঐ ধরণের অহেতুক ভয়ে আক্রান্ত শিশু-কিশোর বিশেষ প্রয়োজনে অথবা একান্ত অপরিহার্য হলেও উঁচুস্থানে যাবে না অথবা কোন বদ্ধ জায়গায় অথবা ছোট ঘরে প্রবেশ করবে না।

অহেতুক ভয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়– (১) বিশেষ অহেতুক ভয় (Specific Phobia), (২) সামাজিক ভয় (Social Phobia) এবং (৩) উন্মুক্ত স্থানের ভয়/সমাবেশের ভয় (Agora phobia)।

(১) বিশেষ অহেতুক ভয় ঃ এই ধরনের ভয়ে আক্রান্ত শিশু-কিশোর সাধারণতঃ কোন বিশেষ বস্তু বা পরিস্থিতির উপস্থিতিতে তীব্র ভয় অনুভব করে। উঁচুস্থানের ভয়, বদ্ধ জায়গার ভয় (লিফট অথবা আন্ডার গ্রাউন্ড) নানা জীবজন্তুর ভয় (বিশেষ করে কুকুর, সাপ, তেলেপোকা, মাকড়সা), রক্তের ভয়, একা থাকার ভয়, অন্ধকারের ভয়, ব্যথার ভয়, বজ্রপাতের ভয় ইত্যাদি হলো বিশেষ অহেতুক ভয়ের উদাহরণ। এই ধরনের ভয়ের সূচনা হয় শৈশবকাল থেকে। শতকরা ২.৪ থেকে ৩.৬ জন শিশু কিশোরদের মধ্যে এই ভয় দেখা যায় (Anderson et al;., 1987; McGee et. al., 1990; Milne et al., 1995)। বিভিন্ন ধরনের বিশেষ অহেতুক ভয়

বিভিন্ন বয়সে শুরু হয় যেমন অন্ধকার এবং জীবজন্তুর ভয় শুরু শৈশবকালে এবং যৌবন প্রাপ্তির আগেই তা অনেকাংশে হ্রাস পায় ((Mark, 1987)। এরপর সাধারনতঃ নয় বছর বয়সে রক্ত ভীতি শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভীতি যেমন দন্তভীতি, বদ্ধ জায়গার ভীতি ইত্যাদি দেখা দেয়।

(২) সামাজিক ভয় ঃ অন্য ব্যক্তি দ্বারা ঋণাত্মক মূল্যায়ণের ভয়, প্রত্যাক্ষাণের ভয় অথবা বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কায় যখন কেউ অন্যলোকের সামনে কথা বলা, খাওয়া অথবা অন্যকোন সামাজিক কাজ পরিহার বা পরিত্যাগ করে তখন তাকে সামাজিক ভীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি বলা হয় (Hope, 1993)। সামাজিক ভীতিকে মূল্যায়ণ বা বিব্রতবোধের ভীতি বলা যেতে পারে। অন্যের উপস্থিতিতে অনেকে কোন কাজ করতে সাময়িক অস্বস্থি বোধ করলেও তা তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন কিন্তু সামাজিক ভীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্যের উপস্থিতিতে অতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা এবং অস্বস্থির অনুভূতি বোধ করেন এবং এ ধরনের পরিস্থিতিকে পরিহার করতে সদা সচেষ্ট থাকেন। শিশুদের মধ্যে যখন সামাজিক সচেতনতার উন্মেষ হয়, নানা প্রকার সামাজিক কাজে যখন তারা জড়িত থাকে এবং যখন আন্তঃপারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে পারে তখন তাদের মধ্যে সামাজিক ভীতির উদ্ভব হয়। একজন সামাজিক ভীতিগ্রস্ত শিশু অথবা কিশোর বিয়ে বাড়ীতে অন্যলোক তাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখবে, অন্যলোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে, খেতে হবে এই ভয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে যায় না। অনেক সময় সামাজিক ভয়ের লক্ষণগুলি সহব্যাধি হিসাবে দুঃশ্চিন্তা বৈকল্য (Anxiety Disorder), বাতিক-বাধ্যতামূলক বৈকল্য (Obsessive Compulsive Disorder) এবং বিশেষ অহেতুক ভীতির সঙ্গেও দেখা যায় (Turner et al., 1990)।

(৩) উন্মুক্ত স্থানের ভয়/সমাবেশের ভয় ঃ জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান, কোলাহলপূর্ণ জায়গা, দোকান পাট, সিনেমা হল, লোকালয় ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এই ভয় গড়ে ওঠে। এই ভয়ে আক্রান্ত শিশু-কিশোরদের মনে হয় এই সমস্ত জায়গায় যাওয়া তাদের জন্যে নিরাপদ নয়। জরুরী অবস্থায় ঐ সমস্ত স্থানে সাহায্য পাওয়ার কোন উপায় নেই ভেবে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে এবং সেখানে যাওয়া পরিত্যাগ করে। বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বের হলেও অস্পষ্ট একটা দুশ্চিন্তা তাদের মধ্যে থাকে তাই বাড়ীতে ফেরার জন্য অত্যন্ত অস্থির হয়ে পরে। নিঃসন্দেহে এই ভয় শিশু-কিশোরদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। তাদের বিচরণক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত হয়ে পরে। অহেতুক ভয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন হলো এই ধরণের রোগী। ভয়ের লক্ষণ ছাড়াও এদের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ, মাথা ঝিমঝিম করা, বার বার একই কথা চিন্তা করা, পাগল হয়ে যাওয়ার ভয় ইত্যাদি উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন গবেষণায় (Milne et al., 1995; Myers et al., 1984) দেখা দেছে অহেতুক ভীতির লক্ষণ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি থাকে। স্কুলগামী শিশুদের অহেতুক ভয় সংক্রান্ত বর্তমান লেখকের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশেও ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে অহেতুক ভীতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি। পরনির্ভরশীলতা, অসহায়ত্ব, নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি বৈশিষ্টগুলি মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি থাকে বলে অহেতুক ভয়ও তাদের মধ্যে বেশি হয় বলে অনুমান করা হয় (Begum and Faroqui, 2000; Ollendick et al., 1985)। যদিও প্রায় সব ধরণের ভয় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি থাকে, সামাজিক ভয় কিন্তু ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রায় সমপরিমাণ থাকে (Ollendick et al., 1985; Hope and Heimberg, 1993; Abe and Masui, 1981)। একটি গবেষণায় Anderson (1994) দেখেছেন যে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি অংশগ্রহণ করতে হয় বলে ছেলেদের সামাজিক ভয় মেয়েদের চেয়ে বেশি থাকে।

সামাজিক ভয়ের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে আমাদের দেশের গবেষণার ফলাফলে অমিল পাওয়া গেছে। সামাজিক ভয়ের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অগ্রগামী (Begum and Faroqui, 2000)। ভয়, লজ্জা এই বৈশিষ্ট্যগুলি মেয়েদের মধ্যে বেশি থাকবে এ ধারণা আমরা অতি অল্প বয়সেই মেয়েদেরকে দিয়ে থাকি আর নানা কারণে আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদেরকে ঋণাত্মকভাবে মূল্যায়ণ করে তাই স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ভয়ও ছেলেদের চেয়ে তাদের বেশি থাকে। তবে পাশ্চাত্য দেশের মত (Straus and Last, 1993) আমাদের দেশেও অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা সামাজিক ভীতিতে আক্রান্ত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত জায়গা অথবা সমাবেশের ভয় বাড়তে থাকে (Ollendick et al., 1994)। আমাদের দেশের গবেষণায়ও অনুরূপ ফলাফল পাওয়া গেছে।

এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে অহেতুক ভীতির সৃষ্টি হয়? অহেতুক ভীতির উৎপত্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনঃসমীক্ষণ মতবাদের প্রবর্তক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে অবদমিত দ্বন্দ্বের কারণে-ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তার উৎপত্তি হয় এবং এর ফলে আত্মরক্ষামূলক কৌশল (Ego Defence Mechanism) হিসাবে অহেতুক ভীতির উদ্রেগ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন শিশু যদি কোন কারণে তার বাবাকে ভয় পায় এবং তা অবদমন করে রাখে তা হলে পরবর্তীতে বাবার প্রিয় পরিধেয় কোন বস্ত্র যেমন টাইকে ভয় পেতে পারে। অনেকের মতে শৈশবকালীন কোন বিশেষ আন্তঃপারস্পরিক সমস্যা অবদমনের ফলে ভীতির উৎপত্তি হয়। তাই শৈশবকালীন কোন ভীতির ঘটনা শিশু ভুলে গেলেও অবচেতন মনে তা সক্রিয় থাকে এবং পরবর্তীতে তার আচরণকে প্রভাবিত করে। যদি কোন ব্যক্তি গোপনে কোন নিন্দনীয় কাজ করে এবং তার মধ্যে অপরাধ বোধের (guilt feeling) জন্ম হয় তাহলে কালক্রমে এই অপরাধবোধ থেকে অহেতুক ভয় জন্ম লাভ করতে পারে।

আচরণবাদীদের মতে অহেতুক ভয় চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ (Classical conditioning) ও করণ-সাপেক্ষীকরণ (Operant conditioning) এই দু'ধরণের শিক্ষণের ফলে বিকাশ লাভ করে। কোন কোন অহেতুক ভয়কে পরিহারমূলক শিক্ষণ (Aviodance learning) এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ভীতিমূলক পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি ভীতি দেখা দিতে পারে যেমন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পরে গেলে অথবা গাড়ী চলাকালীন কোন দুর্ঘটনা হলে পরবর্তীতে সিঁড়ি অথবা গাড়ীকে ভয় পাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে অনেকের মধ্যে পূর্ব ভীতিমূলক অভিজ্ঞতা ছাড়াই ভীতির উদ্রেগ হতে পারে।

অনেক সময় শিশুরা অন্যের বিশেষ করে মা, বাবার ভীতিমূলক প্রতিক্রিয়াকে অনুকরণের মাধ্যমে অহেতুক ভয় অর্জন করে। তাই মা তেলেপোকাকে ভয় পায় দেখলে অনেক শিশুই তেলেপোকাকে ভয় পেতে শিখে। কেবল অন্যকে অনুকরণ বা পর্যবেক্ষণ করেই নয় কোন ভয়ের বস্তুর বর্ণনা শুনেও শিশুরা ভয় পেতে শেখে। দৈত্যদানব বা রাক্ষসের ভয় এভাবেই শিশুর মধ্যে সৃষ্টি হয়।

অবহিতিমূলক মতবাদ অনুসারে অহেতুক ভীতির কারণ এবং স্থায়ীত্বের সঙ্গে আবেগ এবং অবহিতিমূলক প্রক্রিয়ার সংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত উদ্দীপক ভীতির উদ্রেক করে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ ঐ সমস্ত উদ্দীপকে বেশি সাড়া দেয়। বয়ঃসন্ধিকালে শিশুরা অন্যের নিন্দা ও সমালোচনাকে ভয় পেতে শুরু করে। দলের সঙ্গে মিশলে সে দলের সদস্যদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারে অথবা নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে এ আশঙ্কায় দলের সঙ্গে মেশার অহেতুক ভয় তার মধ্যে দেখা যায়। সামাজিক ভয় সাধারনতঃ এ ভাবেই শিশু-কিশোরদের মধ্যে উদ্রেগ হয়। সামাজিক দক্ষতা অর্জনের অভাবেও (Social skill deficites) শিশু-কিশোরদের মধ্যে সামাজিক ভয় দেখা দিতে পারে।

অনেকের মতে অহেতুক ভীতি বিকাশে বংশগতি ও জৈবিক কার্যাবলীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। অতি সংক্ষেপে এখানে অহেতুক ভয়ের কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো।

যে উদাহরণটি দিয়ে এ প্রবন্ধটি লেখা শুরু করা হয়েছিলো এখন সেই ছোট্ট মেয়ে লিরার সিঁড়িকে অহেতুক ভয়ের কারণ কি তা ব্যাখ্যা করা যাক। আসল ঘটনাটি ছিল একদিন সবার অলক্ষ্যে স্কুলের ফুল বাগান থেকে একটি গোলাপফুল ছিঁড়তে গিয়ে লিরা সহকারী প্রধান শিক্ষিকার হাতে ধরা পরে। তিনি লিরাকে ফুল ছেঁড়ার জন্য বকাবকি করেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ কাজ করলে তাকে ভীষণ শাস্তি দেয়া হবে বলে সাবধান করে দেন। এই ঘটনার পর থেকে লিরা ঐ শিক্ষিকাকে ভীষণ ভয় পেতে শুরু করে। সহকারী প্রধান শিক্ষিকার রুম ছিল দোতলার সিঁড়ির পাশেই। তাঁর রুমের সামনে দিয়ে লিরাকে ক্লাসে যেতে হবে, বিকল্প কোন পথ নেই। অহেতুক ভয় অনেক ক্ষেত্রে ভয় উদ্রেককারী উদ্দীপক থেকে সরে গিয়ে আরেকটি নিরপেক্ষ বস্তু অথবা পরিস্থিতিতে স্থানান্তরিত হয়। লিরার ক্ষেত্রে শিক্ষিকার ভয় সিঁড়িকে ভয় পাওয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

নানা মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রয়োগ করে শিশু-কিশোরদের অহেতুক ভীতি দূর করা যায় তবে কোন একটি বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে শিশু-কিশোরদের সব ধরনের অহেতুক ভয় সারানো সম্ভব নয়। চিকিৎসার প্রথমে প্রয়োজন অহেতুক ভয়ের প্রকৃতি, পৌণঃপৌনিকতা, তীব্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা। তারপর ভয়ের উৎস ও প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে মনোচিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

অহেতুক ভয় যে এক প্রকার মানসিক ব্যাধি তা অনেকেই জানেন না বা জানলেও স্বীকার করতে চান না অথবা মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন না। শিশু-কিশোরদের মা বাবা এবং শিক্ষক তাদের সঙ্গে অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন তাই তাঁরা তাদের নানা ধরণের অহেতুক ভয়ের লক্ষণগুলি সনাক্ত করতে পারেন। সঠিক সময়ে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিশু-কিশোরদের অহেতুক ভয় প্রতিরোধ করা যেতে পারে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে অহেতুক ভয়ের দুর্বিসহ কবল থেকে রক্ষা করে তাদেরকে সুমানসিক স্বাস্থের অধিকারী করে গড়ে তোলা সম্ভব।

অবাঞ্ছিত ও মাত্রারিক্ত ভয় শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের পরিপন্থী সুতরাং ঐ ধরনের ভয় যেন শিশু-কিশোরদের মনে জন্ম নিতে না পারে সে দিকে অবশ্যই আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। আপনার অথবা আপনার পরিচিতি শিশু-কিশোরদের মধ্যে অহেতুক ভয়ের লক্ষণ দেখা দিলে আপনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নিন। প্রয়োজনে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ঐ বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং প্রশিক্ষণরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীরা অহেতুক ভয় সঠিকভাবে সনাক্ত করে সুচিকিৎসাদানের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবেন।

[প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।]

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর রোকেয়া বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে বি,এ এবং এম, এ সম্পন্ন করার পর মনোবিজ্ঞানে এম,এ, করেছেন এবং পরবর্তিতে ভিয়েনা থেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজীর উপর পি,এইচ,ডি ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।